গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা | ১১ - ১৭ জুলাই ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এই দুর্বৃত্তরাজ
নীতিহীন রাজনীতিরই পরিণাম

● *আর জি কর থেকে কসবা— নারী নিরাপত্তার বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট থেকে কসবা থানা পর্যন্ত দলের মহিলা কর্মীদের মিছিল ও বিক্ষোভ। ৫ জুলাই*

যে গভর্নিং বডি দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজে ছাত্রী-ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্রনেতা মনোজিৎকে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করেছিল, সেটাই নাকি অবৈধ! ২৫ জুন কলেজছাত্রীর সেই ভয়ানক ধর্ষণকাণ্ডের পর থেকে মনোজিতের দুষ্কর্মের অসংখ্য ঘটনা যেমন সামনে আসছে, তেমনই রাজ্যের কলেজে কলেজে ছড়িয়ে থাকা এমন অসংখ্য মনোজিতের কথাও উঠে আসছে।

নিজেদের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সর্বত্রই মানুষ দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু কলেজে কলেজে এই দুষ্কৃতীরাজ এমন পাকাপোক্ত ভাবে কায়েম হল কী করে? বাস্তবে এই বিষবৃক্ষের বীজ এ রাজ্যে রোপণ হয়েছিল অনেক আগেই।

চারের পাতায় দেখুন

যাত্রী সুরক্ষা উপেক্ষিত, নজর ভাড়াবৃদ্ধিতেই
প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

সংসদকে এড়িয়ে প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করে আজ থেকে চূড়ান্ত অন্যায় ভাবে যে রেলভাড়া বৃদ্ধি করা হল, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ভাড়া বৃদ্ধি করা হল, অথচ চরম অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রইল সুরক্ষা ব্যবস্থা, যাত্রীদের সুযোগসুবিধা, সময়মতো ট্রেন চলাচল, রেলের কামরাগুলির দুর্দশা, স্রেফ নাম পাল্টে প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিকে এক্সপ্রেস ট্রেন করে দিয়ে টিকিটের দাম বাড়ানো, সাধারণ কামরার সংখ্যা ক্রমাগত কমানো, শৌচাগারগুলিকে ঠিকমতো পরিষ্কার করা, রেলযাত্রার সময়ে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করার মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি। রেললাইনগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, সুরক্ষা-পরীক্ষা, খাবার সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া এবং ব্যাপক দুর্নীতি ও ক্রমাগত কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণে রেল-দুর্ঘটনায় যাত্রীমৃত্যু নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রেনযাত্রীদের জন্য প্রাথমিক পরিষেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে প্রকাশ্যে বা গোপন কৌশলে নিয়মিত ভাড়া বৃদ্ধির ঘটনাটি থেকে, বিজেপি শাসনে জনগণ কী পেল তা স্পষ্ট হয়ে যায়। রেলব্যবস্থা বেসরকারিকরণের কাজ যে ভাবে পুরোদমে চলছে, তাতে স্পষ্ট যে, আগামী দিনে ভাড়া বৃদ্ধির আরও বোঝা জনগণকে বইতে হবে।

এই বহুবিধ আক্রমণ রুখতে আমরা যাত্রীসাধারণ সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

ভোটারদের ঘাড়ে নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় বিহারে
ঘুরপথে এন আর সি-র চেষ্টা বিজেপি সরকারের

মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে বিহারের প্রায় ৮ কোটি ভোটারের বিশেষ এবং নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সেরে ফেলার মতো একটি অবাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। যে কমিশনের প্রধান ক'দিন আগেই গর্ব করে বলেছেন, 'এটা নতুন নির্বাচন কমিশন'। স্মরণে আসে সাম্প্রতিক কালে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির একেবারে ছোটখাটো নেতাদের 'এটা নতুন ভারত' এই লজ্জটি। দুই লজ্জের গভীর মিল। বর্তমান সময়ে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের প্রক্রিয়াটাই সরকারের কুক্ষিগত হয়েছে। ফলে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা সামগ্রিকভাবেই আজ প্রশ্নের মুখে। তার ওপর বিজেপির ভাষাতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এই উক্তি সেই প্রশ্নকেই আরও জোরদার করে। এই পরিস্থিতিতে বিহারে ভোটের মাত্র দুই তিন মাস আগে এমন নিবিড় সংশোধন নিয়ে প্রশ্ন না উঠে পারে না।

কেন প্রশ্ন উঠছে? বিহারে নির্বাচন কমিশন বলেছে ভোটার তালিকায় নাম থাকতে গেলে ১৯৮৭-র আগে জন্মানো ভোটারদের জন্মস্থানের ও জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র, ১৯৮৭ থেকে ২০০৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত জন্ম হলে নিজের ছাড়াও বাবা অথবা মায়ের জন্মের স্থান ও তারিখের প্রমাণপত্র আর তার পরে যারা জন্মেছে তাদের জন্য নিজের এই প্রমাণপত্রের সাথে বাবা মা উভয়েরই জন্মের একই ধরনের প্রমাণ লাগবে। এ ক্ষেত্রে আধারকার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, ১০০ দিনের কাজের জবকার্ড, রেশন কার্ড, সরকারি ব্যাঙ্কের পাশবই ইত্যাদি সহজলভ্য কোনও নথিই গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র ১১টি নথি যা নির্বাচন কমিশন বলে দিয়েছে তা দিতে পারলে ভোটার তালিকায় নাম থাকবে, না হলে বাতিল। ইতিমধ্যেই এই বিশেষ সংশোধনীর ফর্ম নিয়ে বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি যেতে শুরু করতেই বিহারের গ্রামে-গঞ্জে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিশেষত দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের নাম এর ফলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ, পরিযায়ী শ্রমিক ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর পক্ষে এই নথিগুলি দেওয়া কার্যত অসম্ভব। তাঁরা যে সরকারি অফিস বা কোর্টে দৌড়ে কাগজ জোগাড় করবেন সে সময়ও নেই। ভোটদানের মতো একটা প্রাথমিক নাগরিক অধিকার নিয়েও বিরাট সংখ্যক মানুষকে অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করানোই কি তা হলে উদ্দেশ্য!

প্রবল প্রতিবাদের সামনে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশন আপাতত শুধু ফর্ম জমা দিলেও তা জমা নিয়ে নিতে বলেছে বিএলওদের। কিন্তু পরেও এইসব নথি দিতে না পারলে কী হবে তা নিয়ে কিছু বলেনি। বিহারে বিজেপির গদি এমনিতেই এখন নড়বড়ে। তাদের জোট সরকারের বিরুদ্ধে জনমানসে ক্ষোভ ব্যাপক। গদি বাঁচাতে এখন তারা বিহারে 'ব্যাপক অনুপ্রবেশ' ও 'ভোটার তালিকা বিদেশিতে ভরে যাওয়া'র মতো মনগড়া অভিযোগ তুলে হইচই তুলছে। অভিযোগ উঠছে, এই কারণেই কেন্দ্রীয় শাসক দলের বকলমে নির্বাচন কমিশন এখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাড়াহুড়ো করে বিরাট সংখ্যক মানুষের নাম ছোটখাটো অজুহাতেও বাদ দিতে। কারণ, বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ বড় অংশকে ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলতে পারলে বিজেপির অভিযোগকে মান্যতা দেওয়া যাবে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট বিজেপির বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, ফলে তাদের সংখ্যা

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকে
৯ জুলাই দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট

● *ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতার বিবাদী বাগে সভা। বক্তব্য রাখছেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস*

লোকাল ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার কোনও চেষ্টা নেই সরকারের

লোকাল ট্রেন দেরিতে চলছে কেন, তার জবাব দিতে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ডিআরএম বলেছেন, 'পরিকাঠামো যা রয়েছে আমরা তার উপর নির্ভর করে যতটা সম্ভব ঠিক সময়ে ট্রেন চালাচ্ছি। কিন্তু খড়গপুর থেকে সাঁতরাগাছি পর্যন্ত নতুন লাইনের প্রয়োজন রয়েছে। সেই লাইন যতক্ষণ না বাড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যা থাকবেই" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬/০৬/২০২৫)। অর্থাৎ তিনি চতুর্থ লাইনের কথা বলতে চাইছেন। একই কথা দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারেরও। তিনি মুম্বাইয়ে সময়মাফিক ট্রেন চলার উদাহরণ টেনে এসইউসিআই(সি)-র প্রতিনিধিদের বলেছিলেন, ট্রেন লেট আটকাতে চতুর্থ লাইনের প্রয়োজন।

চতুর্থ লাইন অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হল, দু'তিন বছর আগেও তো বর্তমানের এই পরিকাঠামো ছিল এবং তখন লোকাল ট্রেন এমন অস্বাভাবিক দেরিতে চলত না। গড় দেরি ধীরে ধীরে এক থেকে দেড় ঘণ্টা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু লোকাল ট্রেনকে ৪/৫ ঘণ্টা দেরিতেও গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেখা যাচ্ছে। এতে যাত্রীদের নানা দিক থেকে হয়রানি এবং ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ক্ষতিপূরণের আশ্বাস কোনও কর্তৃপক্ষের থেকে পাওয়া যায়নি। ফলে কেবল চতুর্থ লাইনের অনুপস্থিতি দেখিয়ে সমস্যাকে লঘু করে দেখা চলে না। অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা দেখতে গিয়ে রেল তার কর্মীসংখ্যা ক্রমাগত কমাচ্ছে। কমাচ্ছে পরিষেবার গুণগত মান। কখনও টিকিটের দাম বাড়িয়ে, কখনো বা লোকাল ট্রেনকে এক্সপ্রেসের তকমা লাগিয়ে, বরিষ্ঠ নাগরিকদের কন্সেশন তুলে দিয়ে যাত্রীভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। দেরি হওয়ার কারণ কর্মী সংখ্যা কমানোর মধ্যে কতটা লুকিয়ে আছে তা দেখা হচ্ছে না। দেখতে হবে চটজলদি জনপ্রিয়তা লাভের আশায় যেভাবে 'বন্দে ভারত' বা এই জাতীয় মহার্ঘ বিভিন্ন ট্রেন চালু করে তাদের গমনাগমনকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে —তার প্রভাব এখানে কতটা। কোন সুদূরে সেই ট্রেন আসছে তার জন্য লোকাল ট্রেনকে মাত্রাতিরিক্ত সময় দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। দেখতে হবে নিরাপত্তার দিকটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিগনালিং ব্যবস্থাকে আরও কত উন্নত করা যায়।

চতুর্থ লাইনের প্রয়োজনকে সত্যিই কি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে? বাস্তবে অগ্রাধিকার পাচ্ছে সাধারণ স্টেশনগুলির অমৃত স্টেশনে রূপান্তরিতকরণ। কয়েকদিন আগে দেশ জুড়ে যে ১০৩টি অমৃত স্টেশনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী তার ৩টি পশ্চিমবঙ্গে। কেবল এই ৩টির জন্য খরচ হয়েছে ২০ কোটি টাকারও বেশি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এমন আরও অমৃত স্টেশনের উদ্বোধন হবে অনতিবিলম্বে। প্রধানমন্ত্রী বা রেলমন্ত্রক এখানে চতুর্থ লাইন নির্মাণের চেয়ে এভাবে অমৃত স্টেশন নির্মাণকে গুরুত্ব দিলে সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ দিনে দিনে বাড়বে।

ভোটাধিকার থেকে একজন নাগরিকও যেন বঞ্চিত না হন

এস ইউ সি আই (সি)

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন কর্মসূচি রদ করার বিষয়ে ২৮ জুন এসইউসিআই(সি)-র এক প্রতিনিধিদল রাজ্যের প্রধান নির্বাচনী অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে একটি পত্র প্রেরণ করেন। নেতৃত্বে ছিলেন দলের বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ কুমার সিংহ।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই কর্মসূচির জন্য নির্বাচন কমিশন একমাস সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বিহারের ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটদাতার তথ্য পরীক্ষা করতে গেলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এর ফলে অনেক ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। তিনি বলেন, ভোটদান প্রতিটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি আবেদন জানান, যাতে একজন ভোটদাতাও এই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। কমিশনের কাছে দলের পক্ষ থেকে এই বিশেষ সংশোধন কর্মসূচি রদ করার দাবি জানানো হয়েছে।

ভোটারদের ঘাড়ে নাগরিকত্ব প্রমাণের দায়

একের পাতার পর

কমাতে পারলে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির গদি রক্ষার একটা চেষ্টা করা যাবে। একই সাথে বিজেপি জানে হিন্দু সম্প্রদায়েরও গরিব মানুষ নথি দিতে না পেরে দিশাহারা হয়ে শাসকদলের দরজাতেই ছুটবে, তাতে শাসক দলের সাথে থাকলে বাঁচিয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে তাদের ভোট কেনা যাবে। বিজেপি জোটের গদি রক্ষার তাগিদে এই ছকেই মানুষের নাগরিকত্বের মতো বিষয় ধরে টান দিতে চেয়েছে বিজেপি।

শুধু বিহারে নয় সারা ভারতেই এই ধরনের বিশেষ সংশোধনের পরিকল্পনা আছে নির্বাচন কমিশনের। এর সাহায্যে ঘুরপথে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই চলছে বলে সারা ভারত জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। দেশের মানুষের নাগরিকত্ব প্রমাণের দায়টা এতদিন ছিল সরকারের। কারা নাগরিক আর কারা নাগরিক নয় তার সমস্ত কাগজ সরকারের কাছেই আছে। এখন সে দায় চাপানো হচ্ছে সাধারণ নাগরিকের ওপর! তারা কোথায় এত কাগজ পাবে? এমনকি বিগত তিনটি লোকসভা নির্বাচনে যাদের ভোট পেয়ে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন পেয়েছেন, তাঁদেরও নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রমাণের দায়টা তাঁদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হল। মনে রাখা দরকার এই বিজেপি সরকারই ২০২১-এর বকেয়া জনগণনা আজও করে উঠতে পারেনি। তারা এখন এত তাড়াতাড়ি সারা দেশে নাগরিকত্বের প্রমাণ সহ ভোটার তালিকা করে ফেলবে? সুপ্রিম কোর্টের সামনেও এডিআর-এর মতো সংগঠন আশঙ্কা প্রকাশ করেছে— এর ফলে সংখ্যালঘু, আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী, পরিযায়ী শ্রমিক সহ প্রায় ৩ কোটি মানুষ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবেন। পরিযায়ী শ্রমিকরা বছরের দীর্ঘ সময় নিজের ভিটেমাটি থেকে দূরে থাকেন। বিএলওরা তাঁদের খোঁজ পাবেন না। সরকার বলে দিয়েছে অনলাইনে ফরম পূরণ করে দিতে। এই দেশের দরিদ্র মানুষের কতজন অনলাইন ব্যবস্থা ব্যবহার করে এই কাজ করতে পারবেন? ফলে তাঁদের পড়তে হবে দালালের খপ্পরে। এ ছাড়াও বিজেপির অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন বলছে— পরিযায়ী শ্রমিকরা যে এলাকায় কাজে যাবেন সেই এলাকারই ভোটার হবেন। এখন এমনিতেই রাজ্যে রাজ্যে বাংলাভাষী বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের বাংলাদেশী বলে দাগিয়ে দেওয়ার হিড়িক তুলছে বিজেপি। এরপর তাঁদের ওই রাজ্যে বসে নাগরিকত্ব প্রমাণ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। অন্যদের ক্ষেত্রেও ভিন রাজ্যে শাসকদলের সাথে না থাকলে কাজ রক্ষাই হয়ে পড়বে অসম্ভব, ফলে তাঁরা শাসকদলের হাতে কার্যত বন্দি হবেন।

আধার কার্ড নিয়ে বিজেপি সরকার এতদিন হইচই করেছে। এখন ব্যাঙ্ক থেকে রেশন দোকান এমনকি হাসপাতাল বা শ্মশানেও আধার কার্ডই ভরসা। এমনকি সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে সবেতে আধার যোগের পক্ষে বিজেপি সরকার জোরালো সওয়াল করেছে। আধারকেই তারা 'ইউনিক আইডি' বলেছিল। সেই আধার কার্ড ভোটে পরিচয় প্রমাণে অকেজো? গরিব মানুষের হাতে সবচেয়ে বেশি থাকে জবকার্ড, তাও বাতিল? সরকারের যুক্তি আধার কার্ড, জবকার্ড নিয়ে দুর্নীতি হয়, কিছু ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে অবৈধদের আধার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে। তাই আধারকে গ্রহণ করা যাবে না। আধার নিয়ে দুর্নীতি হলে, তার দায় কার? সাধারণ নাগরিকের, নাকি সরকারের? পুরনো ভোটারদের সচিত্র এপিক কেন প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে না? নির্বাচন কমিশন তো সব যাচাই করেই তা দিয়েছে। সেখানে গাফিলতির দায় তো সাধারণ ভোটারের হতে পারে না। কমিশন এবং সরকারের অপদার্থতার দায় নাগরিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে কেন?

কেন নির্বাচন কমিশনের বকলমে বিজেপি সরকার এই পরিকল্পনা নিল? তারা এখন দেশ জুড়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ চাইছে। সাধারণ মানুষ আজ বিজেপি সরকারের অপশাসনে চাকরি, শিক্ষা, অধিকারের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছে। তাদের ধোঁকা দিতে বিজেপি সরকারের পরিকল্পনা মানুষের সমস্যার সম্পূর্ণ দায়টা চাপিয়ে দেওয়া 'অনুপ্রবেশকারী'দের ওপর। কিন্তু বাস্তবে এত অনুপ্রবেশকারী তারা পাবে কোথায়? তাই ভিনরাজ্যের মানুষ, সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অন্য রাজ্যে প্রবাসী বাংলাভাষী জনগণ তাদের সকলের বিরুদ্ধে নানা রাজ্যে একটা অবিশ্বাসের বাতাবরণ ছড়িয়ে দিয়ে তাদের 'অনুপ্রবেশ' তত্ত্বকে সঠিক প্রমাণ করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও সংখ্যালঘুকেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া তাদের মতলব। এতে খেটে খাওয়া মানুষ তার বহু প্রতিবেশীকে শত্রু ভেবে নিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়বে। ঠিক এই কারণেই এনআরসি চালুর অপচেষ্টা সারা দেশে করেছে বিজেপি সরকার। দেশজোড়া প্রতিবাদের সামনে তারা পিছিয়ে গেলেও আবার পিছনের দরজা দিয়ে তা চালুর চেষ্টা এই পথেই শুরু করা হচ্ছে বলে মানুষের আশঙ্কা। আসামে এনআরসি নিয়ে কী সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক ও বৈরিতার বাতাবরণ বিজেপি তৈরি করেছে সে অভিজ্ঞতা মানুষের আছে। বিজেপির আশা, এই কাজটা করতে পারলে শাসকদল হিসেবে তারা পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাসের ভূমিকাটা ঠিক ঠিক পালন করতে পারবে। পুঁজিপতি শ্রেণি অবাধে তার শোষণের রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারবে। বিজেপির ওপর তাদের আশীর্বাদও বজায় থাকবে। অনুপ্রবেশকারীদের ধরা এবং সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার দায়টা যে কেন্দ্রীয় সরকারের, সেই বিষয়টাই গুলিয়ে দিয়ে এক অংশের নাগরিককে অপর অংশকে সন্দেহের চোখে দেখাতে অভ্যস্ত করে তোলা হবে। এই কারণেই ভোটার তালিকায় নাম তোলার মতো একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে এত জটিল করে তুলছে নির্বাচন কমিশন। অথচ নির্বাচন কমিশন বলতে পারেনি মহারাষ্ট্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি কেন্দ্রে কী করে ঠিক গত বিধানসভা ভোটের আগে ব্যাপক সংখ্যায় ভোটার বেড়ে গেল? বলতে পারেনি কোন জাদুতে গত লোকসভা নির্বাচনে কিছু কেন্দ্রে ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা বাদে হঠাৎ ভোটদাতার সংখ্যা বিপুল হারে বেড়ে যেতে পারল? বিহারে তড়িঘড়ি এই বিশেষ সংশোধনীর নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রধান নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে এস ইউ সি আই (সি) দাবি করেছে, ভোট দেওয়া সমস্ত নাগরিকের অধিকার। তা নিশ্চিত করার দায় নির্বাচন কমিশন ও সরকারকেই নিতে হবে এবং এই বিশেষ অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নিজের এলাকার ভোটার লিস্টেই রাখার দাবি এ আই ইউ টি ইউ সি-র

ভারতের নির্বাচন কমিশন পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম তাদের বাড়ির ঠিকানার ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে ভিনরাজ্যে তাদের কর্মক্ষেত্রের এলাকায় তালিকাভুক্ত করার যে নকশা তৈরি করেছে, তার তীব্র বিরোধিতা করে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ৫ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, এর ফলে কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক ভোট দেওয়া এবং ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার গণতান্ত্রিক অধিকার হারাবে। তিনি বলেন, কাজের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার ফলে যারা নানা রাজ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়, তাদের নাম কোন রাজ্যে থাকবে? এই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশাল অংশ চুক্তি শ্রমিক, ফলে তাদের এ রাজ্য থেকে সে রাজ্যে যেতে হয়। স্পষ্টতই, একটা বিরাট অংশের নাগরিকদের অধিকার হরণ করার এ এক হীন পরিকল্পনা যা ভোটের স্বার্থে এবং ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে বিজেপি সরকার করছে।

দেশের শ্রমজীবী ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, বিশেষ করে কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিককে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়ে এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বান জানান তিনি।

সর্বহারা গণতন্ত্র নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে কাজ করতে শেখায়

শিবদাস ঘোষ

''ভারতবর্ষে দিন যত এগোচ্ছে, ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের স্থায়িত্ব যত বাড়ছে, বুর্জোয়া সমাজের প্রতিক্রিয়ার দিক যত প্রকট হচ্ছে, ততই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাব সমাজের মধ্যে সুবিধাবাদের আকারে দেখা দিচ্ছে বেশি। রাশিয়ার বিপ্লব বা চিনের বিপ্লব ঠিক আজকের মতো করে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়নি, ফলে তারা তা অনুভব করেনি।...আর, এখানে ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শাসন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। এ যদি না হত, আমরা যদি ১৯৩০ সালের মধ্যে, '৪৭ সালের মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্ব শেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে ফেলতে পারতাম, তা হলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি বুর্জোয়া সমাজ পরিবেশের মধ্যে প্রকট বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের ব্যাপারটাকে পার্টি গঠন করার সময় এত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ রাখবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু আমাদের এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ রাখার প্রয়োজন হয়েছে। কারণ, ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা স্বল্পকালের জন্য হয়নি, স্বল্পমেয়াদি হয়নি। এই অবস্থায় আমরা ভুলতে পারি না যে, এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের ব্যাপারটা লক্ষ রেখে না এগোলে, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। যত কষ্টকর হোক, এ জিনিস লক্ষ রেখে আমাদের এগোতে হবে, একে ঠিক জায়গায় ধরিয়ে দিতে হবে। পার্টির মধ্যে তর্কবিতর্ক, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা, আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সমস্ত কিছুকে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে। এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদ কী ভাবে কোথায় কী রূপে মাথা তোলে, কী ভাবে তার দ্বারা ব্যক্তি কলুষিত হয়, দলের সর্বহারা গণতন্ত্রের পরিবেশ নষ্ট হয়, তা ধরিয়ে দিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে যে, ব্যক্তিবাদ সর্বহারা গণতন্ত্রকে সুবিধায় পর্যবসিত করে।

সর্বহারা গণতন্ত্র আলাদা করে কোনও ব্যক্তির সুবিধা পাওয়ার জন্য বা কোনও ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য নয়— তা সমস্ত ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে কাজ করতে শেখাবার জন্য। সমস্ত শ্রমিক শ্রেণির সামগ্রিক আন্দোলনের স্বার্থে ব্যক্তিসত্তার প্রভাব ও আক্রমণ থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে মুক্ত ও রক্ষা করার জন্যই সর্বহারা গণতন্ত্র। এ ভাবে না বুঝলে আজকের দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের চলবে না।''

(বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান)

বিশ্ব খুঁজেও সমর্থক পাচ্ছেন না 'বিশ্বগুরু'

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে সদ্য অনুষ্ঠিত 'ব্রিকস' সম্মেলনে কিংবা ভারত, আমেরিকা, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গড়ে ওঠা চতুর্দেশীয় কোয়াড-এর বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নেওয়া যৌথ বিবৃতিতে পহেলগামের জঙ্গি হামলার কড়া নিন্দা করা হয়েছে। ব্রিকস থেকে ঘোষিত বিবৃতিতে জঙ্গি হামলার নিন্দার পাশাপাশি সন্ত্রাস প্রসঙ্গে 'শূন্য সহনশীলনতা'-র নীতির কথা এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে রাষ্ট্রগুলির সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা উচিত বলে বলা হয়েছে। কানাডায় অনুষ্ঠিত জি-৭ কিংবা চিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই কোঅপারেশন সম্মেলনে পহেলগাম কাণ্ডের বিরোধিতা করে কোনও বিবৃতি দেওয়ানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পর এই দুটি বিবৃতিতে পহেলগামের উল্লেখকে বিজেপি সরকার এক বিরাট কূটনৈতিক জয় বলে প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু তাতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই ঘোষণার মধ্যে ভারতের নতুন করে জয় হল কোথায়? পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের নিন্দা তো ঘটনার পর সব দেশই করেছিল। নিরীহ, নিরস্ত্র ২৬ জন পর্যটককে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করার নিন্দা করবে না, এমন আচরণ কোনও দেশের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ, ব্রিকস এবং কোয়াড বিবৃতিতে পুরনো নিন্দার কথাই নতুন করে উচ্চারিত হয়েছে মাত্র। পহেলগাম হামলার পিছনে পাকিস্তানের মদতের বিষয়টির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিন্দার জন্য সরকারের মন্ত্রী-আমলারা হন্যে হয়ে যে চেষ্টা চালাচ্ছেন, সেই পাকিস্তানের কোনও উল্লেখ কোনও বিবৃতিতেই নেই। তাই এর মধ্যে কূটনৈতিক বা অন্য কোনও ধরনের জয়ই নেই। প্রশ্ন হল, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্ত্রাসবাদীরা কারা, তাদের পরিচয় কী, কারা তাদের মদতদাতা— এই প্রশ্নগুলির উত্তর বিশ্বের সামনে স্পষ্ট করে ভারত এখনও পর্যন্ত রাখতে পেরেছে কি? যদি তা পেরে থাকে তবে বিশ্বের অন্য দেশগুলিকে সহমত করানো গেল না কেন? কেন এই প্রশ্নে ভারত কোনও বন্ধুরাষ্ট্র খুঁজে পেল না? এর দায় কার?

পহেলগাম ঘটনার পরেই ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে টিআরএফ (দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট) নামে এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, যেটি পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবার মদতপুষ্ট। পক্ষান্তরে পাকিস্তানকেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে সরকার।

পহেলগামের ঘটনায় গোয়েন্দা দফতর এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ দেশের মানুষের প্রবল ক্ষোভের সামনে পড়ে দিশাহীন সরকার পাকিস্তানের উপর সামরিক আক্রমণ চালায়। বলা হয়, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের আশ্রয়স্থলগুলি গুঁড়িয়ে দিতেই এই আক্রমণ। পাশাপাশি এই আক্রমণের লক্ষ্য রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানেকেও বিশ্বের সামনে সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা বলে চিহ্নিত করে 'একঘরে' করে দেওয়া।

ভারত-পাকিস্তান আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ তিন দিন ধরে চলার পর হঠাৎ গোটা বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনও রকম শর্ত ছাড়াই দুই দেশের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে দেন। ভারত সরকারও চুপচাপ তা মেনে নেয়। পহেলগামে হত্যাকারী সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত করা, তাদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়া, পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া অন্য সন্ত্রাসবাদীদেরও ভারতের হাতে তুলে দেওয়া, ভবিষ্যতে সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের আর মদত না দেওয়ার কথা ঘোষণা করা— এ সব কোনও কথাই ভারত সরকার যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে তুলতে ভুলে গেল। নিদেন পক্ষে এতগুলি মানুষের নৃশংস হত্যার জন্য পাকিস্তানের নিন্দেটুকুও ট্রাম্প সাহেবের থেকে দাবি করতে পারল না। কেন পারল না? কেন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রশ্নে এমন সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করল সরকার? তবে কি ট্রাম্প যে কথা বলছেন— বাণিজ্যের চাপেই ভারত যুদ্ধবিরতি মানতে বাধ্য হয়েছে, এটাই সত্যি? তবে কি বাণিজ্যের স্বার্থ সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার থেকে বড় হয়ে উঠল?

এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার দেশের মানুষের তীব্র প্রশ্নের মুখে পড়ল যে, যুদ্ধে তা হলে ভারত কী করল অর্জন? যে ট্রাম্পকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর বন্ধু বলে দাবি করে এসেছেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরার ছবি মার্কিন ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ হিসাবে দাখিল করে এসেছেন সেই ট্রাম্পের আমেরিকা তো বটেই, এমনকি অন্য কোনও দেশই কেন ভারতের সমর্থনে পাকিস্তানের নিন্দায় এগিয়ে এল না? কেন বিশ্ব খুঁজেও কোনও সমর্থক পেলেন না 'বিশ্বগুরু'?

অন্য দিকে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশের ভিতরে বিজেপি এবং আরএসএস বাহিনী, তাদের আইটি বাহিনী যে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষের পরিস্থিতি তৈরি করে হিন্দুত্বের জিগির তুলল, বিরোধী দলগুলিও সেই জোয়ারে ভেসে গেল এবং কার্যত শাসক বিজেপিকে সন্ত্রাস মোকাবিলার নামে যা-খুশি করার ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বসল। এই সুযোগ হাতছাড়া করল না ধুরন্ধর শাসক বিজেপি। তারা পরিস্থিতি বোঝাতে দেশে দেশে সর্বদলীয় সাংসদ দল পাঠানোর কথা ঘোষণা করল এবং বিরোধী দলগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিল। ৫৯ জন সাংসদকে সাতটি দলে ভাগ করে বত্রিশটি দেশে পাঠাল সরকার। এবং তাঁরা বিদেশে গিয়ে কী বক্তব্য রাখবেন তা-ও সরকারের পক্ষে থেকে ঠিক করে দেওয়া হল। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে তাঁরা জনগণের করের টাকায় বিশ্বভ্রমণ করে ফিরে এলেন। ফল কী হল? কানাডায় অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে কিংবা প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ চিনে অনুষ্ঠিত ২০টি দেশের সাংহাই কোঅপারেশন সম্মেলনে উপস্থিত থেকেও যৌথ প্রস্তাবে পাকিস্তানের নিন্দার কথা ঢোকাতে পারলেন না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এতবড় একটি হত্যাকাণ্ড, যার জন্য পাকিস্তান দায়ী ঘোষণা করে ভারত সে দেশে সামরিক আক্রমণ চালাল, বিশ্বের কোনও দেশ (ইজরায়েল ছাড়া) কেন তবে পাকিস্তানের নিন্দা করল না? তা হলে সংসদীয় দলগুলি এই সব দেশগুলিতে গিয়ে কী বুঝিয়ে এল? বাস্তবে এই সংসদীয় দলগুলি বিদেশে গিয়ে যে কেবল শূন্যেই তরোয়াল ঘুরিয়ে ফিরে এসেছেন এবং তাঁদের পিছনে খরচ করা কোটি কোটি টাকা যে কার্যত জলে গিয়েছে তা আজ বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। বিদেশমন্ত্রী নিজেও তো বেশ কয়েকটি দেশে সফর করে এলেন। তিনিই বা কী বোঝালেন? প্রধানমন্ত্রী তো দেশে দেশে ঘোরা এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের জড়িয়ে ধরায় বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন। তা তিনিই বা এত দিন কেমন সম্পর্ক তৈরি করলেন যে প্রয়োজনে কোনও দেশকেই পাশে পাওয়া গেল না? এর জন্য দায়ী কি সরকারের অপদার্থতা, তার নীতিপঙ্গুত্ব, নাকি অন্য কিছু?

অন্য দিকে ভারতের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও আইএমএফ পাকিস্তানকে এক বিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর করে দিল। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ৮০০ মিলিয়ন ডলারের বিশেষ প্যাকেজ মঞ্জুর করল। এমনকি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাস দমন কমিটির সহ-সভাপতির পদ পেয়ে গেল পাকিস্তান।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বৈরিতা কংগ্রেস আমল থেকেই ছিল। এই বৈরিতা দুই দেশের শাসক শ্রেণি তাদের সংকীর্ণ স্বার্থেই জিইয়ে রেখেছে। পুঁজিবাদী শাসকদের অপশাসনে জনগণের বিক্ষোভ তুঙ্গে উঠলে দুই দেশের শাসকরাই জনগণের ক্ষোভ থেকে নিজেদের আড়াল করতে একে অপরকে শত্রু খাড়া করে। বাস্তবিক বিজেপি ক্ষমতায় বসার পর এই বৈরিতা আরও বেড়েছে। প্রতিবেশী প্রায় সব দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক ক্রমাগত খারাপ হয়েছে। কোনও একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হলে হয়তো সেই দেশের দায় বলা যায়। কিন্তু সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হলে তো নিজের ত্রুটিটা আগে খুঁজতে হয়। কিন্তু সেই কাজটি বিজেপি সরকারকে কেউ কখনও করতে দেখেনি। বরং তার বৃহৎ শক্তিসুলভ আধিপত্যবাদ, তার শক্তিমত্ত দম্ভ, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিগির কখন তাকে প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে শাসক রাষ্ট্রনেতারা তা টেরও পাননি। ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে যে আধিপত্যবাদ ভারতীয় শাসকরা প্রতিবেশী দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে সেই সব দেশে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়েছে। সেই সুযোগ নিয়েছে আর এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চিন। তারা এর সুযোগে এই সব দেশে প্রভাব বাড়াতে পেরেছে।

এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে গিয়ে ভারত সরকার মার্কিন ফাঁদে পা দিয়েছে। বন্ধুত্বের নাম করে চিনের বিরুদ্ধে ভারতকে আমেরিকা শুধু ব্যবহারই করেছে, বন্ধুত্ব যে ঠুনকো, সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকা যে কারওরই বন্ধু হতে পারে না, দ্বিতীয় বার জিতে আসা ট্রাম্পের ভারতের উপর শুল্ক বোঝা চাপানোর হিড়িক দেখে কিংবা ভারতীয় অভিবাসীদের হাতকড়া পরিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানো থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় সবটাই নির্ধারিত হয় নিজ নিজ দেশের পুঁজিপতিদের সামগ্রিক স্বার্থের নিরিখেই। এই দ্বন্দ্বে কখনও একটু সুবিধাজনক পরিস্থিতি আসে,

সাতের পাতায় দেখুন

দুর্বৃত্তরাজ নীতিহীন রাজনীতিরই পরিণাম

একের পাতার পর

প্রথমে কংগ্রেস এবং তারপর সিপিএম জমানায় শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের একচ্ছত্র দাদাগিরি প্রত্যক্ষ করেছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রসংসদ পরিচালনার নামে অবৈধ কার্যকলাপ, ক্যাম্পাসে মদ-জুয়ার ঠেক, ছাত্রী ও মহিলা কর্মচারীদের সাথে অভব্য আচরণ, প্রতিবাদী বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের নোংরা কটূক্তি ও মারধর, এমনকি ছাত্রী-কর্মীদের গায়ে হাত তোলা কিছুই তারা বাদ দেয়নি। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইউনিয়ন দখল করতে মারদাঙ্গা, গুণ্ডাবাজি, বোমা-গুলির রমরমা চালিয়ে গেছে অবাধে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসক-ঘনিষ্ঠ এক শ্রেণির অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীর মদতে ইউনিয়ন নির্বাচনে চালিয়েছে চূড়ান্ত দুর্নীতি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বংস করেছে সার্বিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ। আর এগুলি করার লাইসেন্স তারা পেয়েছে দলের নেতাদের কাছ থেকেই। এ ভাবে বছরের পর বছর এক অংশের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীর সহায়তায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব চলাটাই যেন ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্যে পালাবদলের পর রাতারাতি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এসএফআই-এর ইউনিয়ন বদলে যায় টিএমসিপি-র ইউনিয়নে। ছাত্র-রাজনীতি থেকে যেহেতু শাসক সিপিএম নীতি-আদর্শকে আগেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল, তাই এই বদলে কোনও অসুবিধাই হয়নি। টিএমসিপি গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে এড়িয়ে গিয়ে ছাত্রসংসদ দখলের পথে নামে। শিক্ষাঙ্গনগুলিতে একই গুণ্ডাগিরি, ভয়ের পরিবেশ চলতে থাকে। এক সময় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন। নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের দাবিদাওয়া যতটুকু জানাতে পারত, তা-ও বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাঙ্গনগুলি হয়ে ওঠে বেপরোয়া দাদাগিরির আর ভর্তি নিয়ে চূড়ান্ত দুর্নীতি এবং বিপুল টাকা লুটের জায়গা। কলেজ প্রশাসনেও দলীয় লোকদের আধিপত্য বাড়তে থাকে। বছরের পর বছর কলেজ ক্যাম্পাসে এই নীতিহীনতার উদ্দাম চর্চা চলেছে।

অনেকে মনে করেন, ছাত্র রাজনীতি-ছাত্র ইউনিয়ন এ সবই যত নষ্টের মূল। ভাবেন, ছাত্রসংসদ না থাকলে দাদাগিরি থাকবে না, ছাত্ররাও বখাটে হবে না। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? কসবা ল কলেজে ২০১৭ সালের পর আর নির্বাচন হয়নি, ছাত্র সংসদও নেই। তা হলে সেখানে এই ধরনের ঘটনা বার বার ঘটে চলেছে কেন? আসলে সমস্যার শিকড় ছাত্র-রাজনীতিতে নেই। তা রয়েছে শাসক দলগুলির চরম দুর্নীতিগ্রস্ত নীতিহীন রাজনীতির মধ্যে।

অভিযুক্ত ছাত্রদের দুষ্কর্মে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের অবাধ প্রশ্রয়ের খবরগুলি প্রকাশ্যে আসছে। তাঁদের অভয়হস্ত মাথায় নিয়েই মনোজিতের মতো দুষ্কৃতীরা বিনা বাধায় বছরের পর বছর ধরে লুট রাজত্ব চালিয়ে যেতে পেরেছে। এই ভাবে তাদের স্পর্ধা আজ এত দূর পৌঁছেছে যে, কলেজের ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন, এমনকি ধর্ষণ করতেও তারা পরোয়া করে না। তারা ধরেই নেয় যে, নেতাদের হাত মাথায় থাকায় কেউ তাদের ছুঁতে পারবে না। বাস্তবে হয়েছেও তাই। থানায় এদের বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ করে ফল মেলেনি। নেতাদের নির্দেশে দলদাস পুলিশ-প্রশাসন মনোজিৎদের গুণ্ডামি-দুর্নীতি-টাকা লুট দেখেও চোখ বুজে থেকেছে। নেতারাও এ সব দেখেও না দেখার ভান করে থেকেছেন। কারণ এরাই তাঁদের কাছে নিয়মিত লুটের বখরা পৌঁছে দেয়। এদের মতো দুষ্কৃতীরা শাসক দলের অস্তিত্বের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে গেছে। এদের উপর নির্ভর করেই দলবাজি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ, এলাকা দখল চলে। চলে ভোটের দিনে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করা থেকে বুথ দখল, ছাপ্পা মারা সবই। এই মনোজিতের দলবলই আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে শাসক দলের হয়ে কাজ করেছে। আইনজীবীদের মারধর করে বের করে দিয়ে নিজের দলবলকে 'কালো কোট' পরিয়ে ছাপ্পা ভোট দিয়ে বাজিমাত করেছে। এ হেন সম্পদদের প্রশ্রয় না দিলে দুর্নীতি আর দাপটের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা শাসক দলের চলে! তাই দেখা যাচ্ছে, এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর রাজ্যে ব্যাপক শোরগোল শুরু হলেও মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ। এই নীরবতার অর্থ দুষ্কৃতীদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ল কলেজের ঘটনার পর ঘোলাজলে মাছ ধরতে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের মতো দলগুলির নেতারা নেমে পড়েছেন। সত্যিই কি বিজেপি নেতারা নারী নির্যাতনের অবসান চান? তা হলে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে নারী নির্যাতনের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন কেন? সে সব রাজ্যে তো বিজেপিকে দেখা যায় অভিযুক্ত নেতা-বিধায়কদের গলায় মালা পরিয়ে বীরের সম্বর্ধনা দিতে! সিপিএম শাসনে বিরাটি, বানতলা, ধানতলার ঘটনা এবং এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর 'এমন তো কতই হয়'— রাজ্যের মানুষ ভোলেননি।

শাসকই যেখানে দুষ্কৃতীদের ত্রাতা, সেখানে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির বদল কীভাবে সম্ভব? পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ক্ষমতালোভী বিরোধী দলগুলি সরকার পরিবর্তনের হাওয়া তুলছে। কিন্তু সরকার পাল্টালেই কি পরিবেশ পাল্টাবে? বন্ধ হবে ধর্ষণ-নারী নির্যাতন?

গভীরে ভাবলে বোঝা কঠিন নয় যে, রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতনের এই জঘন্য পরিবেশ তৈরির জন্য আসলে দায়ী নীতিহীন দুষ্কৃতীনির্ভর রাজনীতি। যে বিরোধী দলগুলি আজ ল কলেজের ঘটনা নিয়ে সরকার পাল্টানোর স্লোগানে গলা ফাটাচ্ছে, তারা নিজেরা যে যেখানে ক্ষমতায় ছিল বা আছে, কোথাওই কিন্তু চিত্র ভিন্ন নয়। যতক্ষণ তারা বিরোধী পক্ষ, ততক্ষণই তারা দুর্নীতি-দুষ্কৃতীরাজের বিরুদ্ধে। মানুষ বার বার দেখেছে, সরকারে বসলেই চরিত্র পাল্টে তারা দুষ্কৃতীদের মদতদাতার ভূমিকা নেয়। শাসক দল হয়ে যায় দুষ্কৃতীদের দাপটনির্ভর। রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলের সেই তিক্ত স্মৃতি আজও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি নারীধর্ষণের ঘটনায় দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। ফলে এই জঘন্য পরিস্থিতির পরিবর্তন সত্যিই চাইলে শুধু সরকার পাল্টে তা হবে না। পাল্টাতে হবে নীতি-আদর্শহীন ক্ষমতালোভী ভোটসর্বস্ব রাজনীতিকে, যে রাজনীতি প্রতি মুহূর্তে এমন অজস্র মনোজিতের জন্ম দিয়ে চলেছে। বিপরীতে শক্তিশালী করতে হবে সেই রাজনীতিকে যা নীতি-নির্ভর। সেই নীতি যা শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়তে শেখায়। যে রাজনীতি চরিত্র দেয়, মনুষ্যত্ব জাগায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করে।

নীতি-আদর্শ বিবর্জিত অপ-রাজনীতির দাপট রাজ্যের হাসপাতাল থেকে শুরু করে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তাহীনতার যে ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি করেছে, তা থেকে এগুলিকে মুক্ত করতে, সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তাই দরকার ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক নির্বিশেষে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জোটবদ্ধ প্রতিবাদ এবং নীতি-আদর্শভিত্তিক সুস্থ রাজনীতির চর্চা। আর জি কর ঘটনায় যে প্রতিবাদী সংস্কৃতি দেখা গেছে তাকে আরও সংগঠিত রূপ দিতে হবে। এলাকায়, প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন কমিটি গড়ে তুলতে হবে। এগুলিই প্রতিরোধের শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

● *নারী নিরাপত্তার দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ। (বাঁ দিক থেকে) পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, কলকাতার সরশুনা, হাওড়ার বাগনান*

● *কসবায় বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজাতা ব্যানার্জী।*
● *(ডানদিকে) নদিয়ার দেবগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল*

প্রতিবাদ জেলায় জেলায়

দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজের মধ্যে ছাত্রীকে ডেকে গণধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ১ জুলাই বাগনানে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল এসইউসিআই(সি)। নেতৃত্ব দেন দলের হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির সম্পাদিকা মিনতি সরকার। ১ জুলাই নদিয়া জেলার দেবগ্রাম বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিল দেবগ্রাম স্টেশন মোড় থেকে কুলিতলা বাজারে যায়।

সেখানে বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএস-এর জেলা সভানেত্রী বাতশোভা বেগম, এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক সেলিম মল্লিক ও এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদক সাইদুল ইসলাম প্রমুখ। এ দিন প্রতিবাদ সভা হয় পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক হাসপাতাল মোড়ে 'আর জি করের পাশে আমরা তমলুকবাসী'র উদ্যোগে।

সভায় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সহ 'অভয়া'র ন্যায়বিচারের দাবি ওঠে। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তারাশঙ্কর সাউ, নার্স লীনা দাস, ডাঃ জয়দেব ঘড়া, শিক্ষক চন্দনা জানা ও শম্ভু মান্না প্রমুখ। সভার পর একটি মিছিল হয়।

উত্তরপ্রদেশে সরকারি স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত
প্রতিবাদে বিক্ষোভ

উত্তরপ্রদেশে পাঁচ হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ অথবা সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জৌনপুর জেলায় একের পর এক স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বদলাপুরেও ছাত্রসংখ্যা কম এই অজুহাতে বেশ কয়েকটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে 'সরকারি স্কুল বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি'-র উদ্যোগে ৪ জুলাই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা জৌনপুরে জেলাশাসক দফতরের সামনে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেন এবং জেলাশাসকের কাছে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্র জমা দেন।

দাবি ওঠে, সরকারি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, অবিলম্বে শিক্ষকদের সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে এবং সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। সরকারি স্কুল বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি'-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শামিম আহমেদ, অশোক কুমার খরবার, রামসিঙ্গার দুবে প্রমুখ।

গুনায় এআইএমএসএস-এর জেলা সম্মেলন

মহিলা ও শিশুদের উপর ক্রমবর্ধমান অপরাধ এবং মাদক প্রসারের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের গুনায় ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হল এআইএমএসএস-এর ষষ্ঠ জেলা সম্মেলন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী জলি সরকার। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রচনা আগরওয়াল, এসইউসিআই(সি)-র জেলা সম্পাদক মনীশ শ্রীবাস্তব। সম্মেলন থেকে সঙ্গীতা আরবি-কে সভানেত্রী ও সীমা রাইকে জেলা সম্পাদক করে ৩৩ সদস্যের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল ও পথসভা

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী ৪টি শ্রম কোড বাতিল, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণ বন্ধ, কৃষিজাত সমস্ত ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা, রেল-ব্যাংক-বিমা-বিদ্যুৎ-ইস্পাত শিল্পের বেসরকারিকরণ বন্ধ, স্মার্ট মিটার বাতিল সহ গ্রাহক ও কর্মী স্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ৩০ জুন পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদা কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড থেকে থার্মাল মোড় পর্যন্ত এআইইউটিইউসি এবং এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে মিছিল ও প্রচার কর্মসূচি হয়।

দিনহাটা ঃ ৯ জুলাই দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে কোচবিহারের দিনহাটায় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ডাকে পরিবহণ শ্রমিকরা মিছিল করেন (ছবি)।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ৩ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কার্যালয় উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কে শ্রীধর। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক বি অমরনাথ।

কর্ণাটকে যুব সভা

'যৌবনই শাসকের বিরুদ্ধতার স্পর্ধা রাখে'— ২৬ জুন এআইডিওয়াইও-র ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বাঙ্গালোরে যুব সভায় দৃপ্তকণ্ঠে এ কথা বলেন বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক বি সুরেশ। তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলিতে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানান।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি ডঃ জি শশীকুমার বলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক যোগ্যতা, দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পাচ্ছেন না। এর জন্য সরকার কী ভূমিকা নিচ্ছে? আমরা শূন্যপদ পূরণের দাবিতে ২০২৪-এর ১৮ জানুয়ারি এখানেই বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস সরকার কিছুই করেনি। বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ শশধর বিলাগী বলেন, মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি কিশোরদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করছে। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড ফুড ডেলিভারি পার্টনারস ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি বিনয় সারথী। সভাপতিত্ব করেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সভাপতি সরণাপ্পা উদবল। ২০টি জেলা থেকে আগত যুবকদের সামনে শুরুতেই বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক সিদ্দালিঙ্গা বাসওয়াড়ি। পরে সভা থেকে এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীকে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেয়।

তেলেঙ্গানা ও তামিলনাড়ুতে কারখানা দুর্ঘটনা
বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি এআইইউটিইউসি-র

এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, তেলেঙ্গানার সিগাচি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে ৪০ জন ও তামিলনাড়ুর শিবকাশীতে একটি কারখানায় দুর্ঘটনায় ৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু ও বহু জনের আহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনায় সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি গভীরতম শোক প্রকাশ করছে। এআইইউটিইউসি দুটি রাজ্যের সরকারের কাছে মৃতদের পরিবারপিছু ২ কোটি টাকা ও আহতদের ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে কারখানাদুটিতে বিস্ফোরণের নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দুর্ঘটনার জন্য দায়ী পদাধিকারীদের কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, কারখানা দুটির কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-নিরাপত্তার সমস্ত নিয়মকানুন কী ভাবে লংঘন করেছে এবং দুই রাজ্য সরকারের তরফে শ্রমিক-সুরক্ষায় নজরদারি কতখানি অবহেলিত হয়েছে— এই দুই দুর্ঘটনা তা স্পষ্ট করে দিল। শ্রমিক-নিরাপত্তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র সর্বোচ্চ মুনাফা লুটের দিকে মালিকদের সমস্ত মনোযোগ থাকায় এই ধরনের দুঃখজনক দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। এটি খুবই উদ্বেগজনক যে, ব্যবসার নিয়মকানুন সহজ করার অজুহাতে যদি শ্রমকোড চালু হয়, তা হলে আগামী দিনে এই ধরনের দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়বে। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আবার দেখিয়ে গেল, ভারতের মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সরকার ও তার সমস্ত নিয়মকানুনের একমাত্র উদ্দেশ্য পুঁজিপতি মালিকদের জন্য বিপুল মুনাফা সুনিশ্চিত করা। শ্রমিকদের জীবন-মৃত্যু নিয়ে তাদের কোনও ভাবনা নেই।

এআইইউটিইউসি দেশের শ্রমিকদের এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে কারখানাগুলিতে শ্রমিক-সুরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে আগামী দিনে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

পালিত হল হুল দিবস

কলকাতা রাজভবন সংলগ্ন সিদো-কানহু ডহরে সিদো-কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩০ জুন পালিত হল হুল দিবস। সিদো-কানহুর শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সহসভাপতি নেপাল সিং।

বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভীষণ সরেন, অনিলবরণ হাঁসদা, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শিখা মাণ্ডি, সরস্বতী হাঁসদা, সত্যচরণ সর্দার ও সমিতির সম্পাদক পরিমল হাঁসদা। বক্তারা দাবি জানান— সিদো-কানহু ডহরে তাঁদের নামাঙ্কিত ফলক লাগাতে হবে ও মূর্তি স্থাপন করতে হবে, ৩০ জুন পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ছুটি ঘোষণা করতে হবে।

পাঠকের মতামত

বৈধ ভোটারদের বাদ দেবে কমিশন!

ভারতবর্ষে নির্বাচন কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ১ জুলাই ১৯৮৭ থেকে ২ ডিসেম্বর ২০০৪-এর মধ্যে যাদের জন্ম তাদের জন্ম তারিখ ও জন্মস্থানের নথির সঙ্গে বাবা অথবা মায়ের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। প্রশ্ন হল ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্মের প্রমাণপত্র এবং তাদের পিতা ও মাতার নাগরিকত্ব প্রমাণে যে ধরনের কাগজ চাওয়া হচ্ছে তা সকলের আছে বলে মনে হয় না। এর পর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০০৪-এর মধ্যে যাদের জন্ম, তাদেরও পিতা ও মাতার সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়া নাগরিকত্বের অন্য প্রমাণ সকলের নেই। এই নির্বাচনী সচিত্র পরিচয় পত্রের মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার একাধিকবার প্রয়োগ করেছেন।

বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে যে আইন প্রয়োগ করতে চলেছে সেটি আগামী দিনে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। বর্তমান নির্বাচনী সংশোধনী তালিকায় এবং নির্বাচনী সচিত্র পরিচয়পত্র এখনও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে উঠতে পারেনি ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। সারা ভারতে অসংখ্য মানুষের নির্বাচনী সচিত্র পরিচয়পত্রে এবং নির্বাচনী তালিকায় প্রচুর ভুল আছে সেগুলি এখনো পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি।

সারা ভারতে প্রত্যেকটি রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেকটি অঞ্চলে নিযুক্ত লেভেল অফিসাররা তাঁদের কাজ এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। সেখানে দাঁড়িয়ে আবার একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করলে আরও নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বাচন কমিশনারকে দিয়ে যে ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে তাতে দেশের সমস্ত মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিকরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবেন। ঘুরপথে এনআরসি চালু হবে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতের সমস্ত মানুষকে সিএএ, এনআরসি-র বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ করে তা প্রতিরোধ করা উচিত।

সুদীপ্ত দে
কৃষ্ণপুর সমরপল্লী, কলকাতা-১০২

ভাবার সময় এসেছে

আর জি কর হাসপাতালের পর সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজের ক্যাম্পাসে ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হতবাক। এই সামাজিক অবক্ষয়ের পরবর্তী শিকার যে আপনার আমার পরিচিত কেউ হবে না, সেই গ্যারান্টি আজ কেউ দিতে পারবে না। ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি তার নিজ নিজ ফয়দার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এ কথা তো সত্য, কোনও রাজনৈতিক দলই, তার নিজের ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় কোনও ধর্ষণ কিংবা নারী অবমাননার ঘটনা ঘটেনি— এরকম দাবি করতে পারবে না। এদের প্রত্যেকের হাতই রক্তে রাঙা— কারও কম তো কারও বেশি। ২০২৪ সালে ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১৫১ জন সাংসদ, বিধায়ক নিজেরাই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন যে তাঁরা নারী নির্যাতনের সাথে যুক্ত। এর মধ্যে ১৬ জন গুরুতর ধর্ষণের অভিযোগে বিদ্ধ। ফলে কোনও বিশেষ দল ক্ষমতায় গেলে যে আর নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটবে না, ইতিহাস অন্তত সে কথা বলছে না।

যে সমাজব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তে এই হৃদয়হীন বিবেকহীন মানুষ তৈরি করে চলেছে তা নিয়ে এই ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলোর কোনও বক্তব্য আছে কি? প্রতিনিয়ত নারীকে ভোগের বস্তুে পর্যবসিত করে চলেছে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, তা নিয়ে এই দলগুলির কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

একটি ফুটফুটে শিশু জন্মাবার পর কীভাবে এই সমাজব্যবস্থায় বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এরকম বিকৃতকাম মানসিকতার শিকার হচ্ছে তা নিয়ে এদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। রাজনৈতিক দলগুলির কাজই হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করে সবকিছু গুলিয়ে দিয়ে যে ভাবেই হোক ক্ষমতায় আসা। একটা কথা খুব প্রচলিত— 'সমস্যার সমাধান করে কেউ কখনও ক্ষমতায় যায় না, যায় সমস্যার সৃষ্টি করে'। আমাদেরও বোঝা উচিত ভোটের মাধ্যমে যে দলকেই আমরা নির্বাচিত করি না কেন তাদের কেউই এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না। এই সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে যে দল যতই দাবি করুক না কেন— 'আমরা ক্ষমতায় এলে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন হবে'— তা আসলে সোনার পাথর বাটি। আর বিচারব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া বারবার মনে করায় 'জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড'।

তাই যতদিন পর্যন্ত না এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এ ধরনের নারকীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবেই।

সৌজন্য চ্যাটার্জী
গুপ্তিপাড়া, হুগলি

'গাজায় আমরা যেন এক একজন নাৎসি'

এক ইজরায়েলি সৈনিকের অন্তর্বেদনা

পৃথিবীর মানচিত্র থেকে গোটা একটা রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনকে মুছে দিতে তার উপর আঘাত নামিয়ে এনেছে সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েল। আর মধ্যপ্রাচ্যের তৈল খনির দখল নিতে এবং গাজায় ইজরায়েলি আগ্রাসনে অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিয়ে দেশের ধুঁকতে থাকা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মন্দা কাটিয়ে তেজি করতে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। মদত দিচ্ছে যুদ্ধ উন্মাদনায়। এ যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে প্রাণ হারাচ্ছে হাজার হাজার গাজাবাসী। তাই গাজার মানুষের বুক চিরে উঠে আসা আর্তনাদ আমাদের বিবেকের দরজায় প্রশ্ন জাগায়— একি সত্যিই কোনও যুদ্ধ? না কি এই গণহত্যা ব্যবসায়ীদের মুনাফা লাভের লক্ষ্যে এক পরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী পৈশাচিক চক্রান্ত? সমাজমাধ্যম, সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসা ইজরায়েলের হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ আর গোলা, বারুদ, বিমান হানায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া গাজার ভয়াবহ চিত্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে অস্থির করে তোলে। হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুর লাশ, নিথর সন্তান কোলে বাবা-মায়ের কান্না, সারি সারি মৃতদেহের দৃশ্য বুকের ভিতর মোচড় দেয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অনাহার, দারিদ্র্য গ্রাস করেছে গাজাবাসীকে। চাই ত্রাণসামগ্রী, চাই বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানীয়।

বিশ্বের নানা মানবাধিকার সংগঠন তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে গাজাবাসীর প্রতি। খাদ্য বিতরণের এই ত্রাণ শিবিরের পাশে শত শত রুগ্ন, ক্ষুধার্ত অপেক্ষারত মানুষের সারি। যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু আসতে পারে জেনেও বেঁচে থাকার তাগিদে মাইলের পর মাইল হেঁটে এসে তারা এখানে ভিড় জমায়। কিন্তু আমরা কী দেখলাম? গত মে মাসের শেষ থেকে জুন মাসের মধ্যে ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকতে থাকা ছ'শোর বেশি গাজাবাসীকে এই ত্রাণ শিবিরের আশেপাশেই পাশবিক উল্লাসে গুলি চালিয়ে হত্যা করল নিষ্ঠুর ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। এই আক্রমণে আহত হয়েছে ৪০০০-এরও বেশি। এই মর্মান্তিক ঘটনা সারা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছে। বিশ্বমানবতার শত্রু একটা যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এবং তার সহযোগী দেশগুলো শুধুমাত্র নিজেদের সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের জন্য কতটা নির্মম হতে পারে তার নির্লজ্জ এক উদাহরণ গাজা গণহত্যা। ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধের স্থান নেই সেখানে। ঘটনার নির্মমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর এক সেনার কথায়— 'ত্রাণ নিতে আসা মানুষদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানোর জন্য উপর থেকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও বাছবিচার চলবে না। এ পরিস্থিতি এমনই অমানবিক যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় আমরা যেন এক একজন নাৎসি, আর গাজাবাসীরা হল তাদের নির্মমতার শিকার ইহুদি জাতি'।

গাজা গণহত্যায় শামিল ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর অত্যাচার-নিপীড়নের বীভৎসতার দৃশ্য আর সেনাবাহিনীর এক সৈনিকের উপরোক্ত স্বীকৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় জার্মানির স্বৈরাচারী শাসক হিটলারের নাৎসি বাহিনীর আক্রমণে পীড়িত ইহুদিদের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা। মাঝে শুধু আট-নয় দশকের ব্যবধান মাত্র। যুগে যুগে শোষক আর শোষিতের চরিত্র বদলায়নি এক বিন্দুও। নারী শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে বর্ণবাদী-শ্রেণিবিদ্বেষী-উগ্র জাত্যাভিমানী হিটলারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ নাৎসিবাহিনী সে দিন হত্যা করেছিল ৬০ লক্ষ ইহুদিকে। বাদ পড়েনি লক্ষাধিক প্রতিবন্ধী ও বিরোধী মতাবলম্বীও। বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে এ এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। আজ ইহুদিবাদী ইজরায়েলি শাসকরা প্যালেস্টাইনের আরব জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যা করছে তা হিটলারের থেকে কম কিছু নয়।

যতদিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন এদের পৃষ্ঠপোষক দেশগুলি তাদের টিকে থাকার প্রয়োজনেই দেশে দেশে যুদ্ধ বাধাবে। কারণ পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়নে ধুঁকতে থাকা শ্রমিক শ্রেণির ক্রয়ক্ষমতা কমছে দিনের পর দিন। বন্ধ হচ্ছে কলকারখানা। বন্ধ উৎপাদন। সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে রচিত এই সমাজব্যবস্থায় এখন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক মন্দা। তাই দেশে দেশে যত যুদ্ধবাধবে, ততই তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। অর্থনীতির সামরিকীকরণ হবে, অস্ত্রশস্ত্রের বিক্রি বাড়লে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কিন্তু 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'। আপামর শিশু-নারী-বৃদ্ধ-যুব এই যুদ্ধে নিদারুণ মৃত্যুবরণ করে। যারা বেঁচে থাকে তাদের জীবন-যন্ত্রণার বিবরণ দেওয়া শক্ত। তাই আজ যুদ্ধবাজ, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সব মানুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। বিশ্বের সচেতন সংগ্রামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ শান্তি আন্দোলনই পারে যুদ্ধ রুখে দিতে। ইজরায়েলের শাসক নেতানিয়াহু হোক, কিংবা আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প— স্বৈরাচারী শাসক ও তার শাসনব্যবস্থা কখনওই স্থায়ী হতে পারে না।

ঋণের দায়ে গোলাপচাষির আত্মহত্যা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ফুলচাষে পাঁশকুড়া ব্লক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ব্লকের পূর্ব ও পশ্চিম গুড়তলা, পারলঙ্কা, মাইশোরা, রাজশহর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম গোলাপ চাষের জন্য বিখ্যাত। কেন্দ্রীয় সরকার ফুলকে অর্থকরী ফসল হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় ফুলচাষিরা সরকারি ঋণের সুযোগ পান না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ বা ফসল বিমার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন তাঁরা।

ফলে ফুলচাষিদের সরকারি ঋণের ভরসা না করে নানা বেসরকারি সংস্থা বা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয়। গত কয়েক বছর ধরে এলাকার ফুলচাষিরা নানা কারণে ভীষণ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। অনেকেই সময়মতো ঋণ শোধ করতে পারছেন না। ঋণদাতা সংস্থা এবং মহাজনদের লোকজন টাকা আদায়ে ফুলচাষিদের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। গত ২৭ জুন পশ্চিম গুড়তলা গ্রামের ফুলচাষি সঙ্গীতা প্রামাণিক পাওনাদারের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। এলাকার বহু চাষি ঋণ শোধ করতে না পেরে ঘরছাড়া।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিরসনে ঋণগ্রস্ত ফুলচাষিদের ঋণ মকুব সহ সহজ শর্তে ঋণ, চড়া সুদের কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ২৮ জুন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

আসামে সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করে সেই জমি দেওয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের

বুলডোজার রাজনীতিতে আসামের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথকেও ছাপিয়ে গেছে। যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় আসার পরই যেমনটা দুষ্কৃতীদের দমন করার নামে বুলডোজার চালিয়ে নিরপরাধ, সংখ্যালঘু মানুষের ঘর-বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তার থেকেও একধাপ চড়া বুলডোজার নীতি গ্রহণ করে চলেছে আসাম সরকার। তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করে ব্যাপক উচ্ছেদ চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছেন, একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের হাত থেকে জমি কেড়ে আনতে তার সরকার দিনরাত কাজ করছে। গত ২৪ জুন আবার সাংবাদিকদের সামনে বলেন, একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যে ভাবে নেশার প্রতি আসক্ত, তেমন তিনিও ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের হাত থেকে জমি কেড়ে আনতে আসক্ত। আর ওই কেড়ে আনা জমি অসমীয়াভাষী মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে বলে হুঙ্কার দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত একটা সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর এমন বিদ্বেষ ভাষণ একদিকে যেমন অত্যন্ত বিপজ্জনক, অন্য দিকে মিথ্যাশ্রয়ীও বটে। কারণ, ২০২১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর উচ্ছেদের বুলডোজার চালিয়ে জমি দখলমুক্ত করা হলেও সেই জমি কিন্তু সাধারণ অসমীয়া জনগণের জন্য জোটেনি। দেওয়া হয়েছে বিপুল পুঁজির মালিক রামদেব, বেদান্ত, আদানি-আম্বানিদের।

অন্যান্য পুঁজিবাদী সরকারগুলির মতো আসাম সরকারও রাজ্যের জনসাধারণের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি যেমন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ইত্যাদির সুরাহা করতে পারেনি। সে জন্য অত্যন্ত চতুরভাবে উচ্ছেদের দ্বারা বিভাজনবাদী রাজনীতিকে সামনে আনতে চাইছে। ক্ষমতায় বসার কিছুদিন পরই দরং জেলার গরুখুঁটিতে এগ্রি ফার্ম করার কথা বলে কয়েক হাজার একর ভূমিতে উচ্ছেদ চালিয়ে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু মানুষকে একেবারে নিঃস্ব করে দেওয়া হয়েছে। আজও এদের মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত হয়নি। তাঁরা আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে অথবা যাযাবরী জীবন যাপন করছেন। তারপর থেকে সরকার স্বদম্ভে একটার পর একটা উচ্ছেদ চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্ছেদ চালানো হয়েছে কাজিরাঙা, পাভ বনাঞ্চল (উত্তর লখিমপুর), সত্রকরা (বাঘবর), বুঢ়াচাপরি (শোণিতপুর), ধিং (নগাঁও), হোজাই বনাঞ্চল, মরিগাঁও অঞ্চলের কয়েক হাজার একর ভূমিতে।

ফলে হাজার হাজার গরিব মানুষ আশ্রয় এবং সহায় সম্বল হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছেন। এই তালিকায় সম্প্রতি সংযোজিত হয়েছে গোয়ালপাড়ার হাসিলাবিল, ধুবুড়ীর বিলাসীপাড়া, নলবাড়ীর বরক্ষেত্রী এবং লখিমপুরের রাংচালি, দেবেরাদলনি। এ ছাড়া উচ্ছেদের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গোয়ালপাড়ার পুরো একটা পঞ্চায়েত, রাখসিনী এবং ধুবুড়ী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ। এই সমস্ত অঞ্চলেই গরিব মানুষ ৫০/৬০ বছর ধরে বসবাস করছেন। এঁদের ঘরে সরকারের দেওয়া বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, আছে রেশন কার্ড, সরকারি স্কুল জল-জীবন স্কিম। অনেকেই সরকারি ঘরও পেয়েছেন। অথচ এদেরই কোথাও বেদখলকারী, কোথাও অবৈধ বাংলাদেশি তকমা দিয়ে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না করেই দেশের সংবিধান, উচ্ছেদ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন এবং মানবাধিকার কমিশনের সমস্ত নীতি নির্দেশকে দু-পায়ে মাড়িয়ে অমানবিক ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাও আবার বিনা নোটিসে বা মাত্র একদিনের নোটিসে। সমরসজ্জায় সজ্জিত শয়ে শয়ে পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনীর দ্বারা রীতিমতো ত্রাস সৃষ্টি করে চালানো হয়েছে উচ্ছেদ। এ সব উচ্ছেদকাজ এতটাই অমানবিক, এতটাই হৃদয়বিদারক যে, সেই দৃশ্য চোখে দেখাটাও দুঃস্বপ্ন! চোখের পলকে বুলডোজারের ঘায়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে গরিব মানুষের একটার পর একটা বাড়ি। অসহায় শিশু থেকে বৃদ্ধ -বৃদ্ধা, নারী-পুরুষের কাতর আর্তনাদ! তাঁদের চোখের জল রাষ্ট্র ও সরকারকে একটাই প্রশ্ন করে চলেছে, কী তাঁদের অপরাধ, কেন তাঁরা খোলা আকাশের তলায়? এদের প্রতি সরকারের কি কোনও দায়িত্ব নেই?

যে সরকার, যে রাষ্ট্র অন্যায় ভাবে ওই শিশুদের সবকিছু কেড়ে নিল, ভবিষ্যতে তাদের থেকে কেমন দেশপ্রেম আশা করবেন রাষ্ট্রকর্তারা? স্বাভাবিক ভাবেই এঁদের বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলবেই। কোনও সভ্য সমাজের পক্ষেই এটা শুভ নয়। রাষ্ট্রকে শাসক শ্রেণির স্বার্থে সাধারণ মানুষের বিরোধী কোনও কাজ করতে গেলে সব সময়ই কোনও না কোনও মিথ্যা গল্প বুনতে হয়। অর্থাৎ মিথ্যা অজুহাত খাড়া করতে হয়। আসামে এই যে হাজার হাজার সহায়-সম্বলহীন মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে সেখানেও সরকারকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই হাজার হাজার মানুষ নাকি অবৈধ বাংলাদেশি জবরদখলকারী! অথচ প্রকৃত সত্যটা হচ্ছে, এঁরা ভারতের বৈধ নাগরিক। এঁরা ৫০/৬০/৭০ বছর ধরে এসব এলাকায় বসবাস করে আসছে। এঁদের বেশিরভাগই নদী ভাঙনের শিকার। নদীভাঙন আসামের অত্যন্ত জ্বলন্ত ও দীর্ঘস্থায়ী এক সমস্যা। ১৯৫০ সালের আগে থেকেই প্রতি বছর হাজার হাজার বিঘা ভূমি নদীগর্ভে চলে যায়। বিগত ৭০ বছরে ব্রহ্মপুত্র এবং তার উপনদীগুলির গর্ভে বিলীন হয়েছে ৪ লাখ ২৭ হাজার হেক্টর বা ৪২৭০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি যা বর্তমান আসামের মোট জমির ৭.৪ শতাংশ। এর মধ্যে যেমন কৃষিভূমি ছিল, তেমনি ছিল বহু গ্রাম, বসতি, হাটবাজার। বিশেষজ্ঞদের তথ্যমতে প্রায় পনেরোশোর বেশি গ্রামের কোনও অস্তিত্ব নেই। এইসব গ্রামের হাজার হাজার মানুষ তা হলে গেলেন কোথায়? এই মানুষরাই সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে এখানে সেখানে যে যেমন ভাবে পারেন আশ্রয় নিয়েছেন। এঁরা নানা চাষবাসের সাথে সাথে দিনমজুরি, শহরে এসে ঠেলা, রিক্সা চালিয়ে কোনও রকমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তির চাপে আসামের সব সরকারই এদের অবৈধ বাংলাদেশি সাজিয়ে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন হল, উচ্ছেদ প্রশ্নে বিজেপি সরকার এতটা অমানবিক, এতটা আগ্রাসী কেন? কেনই বা একটা বিশেষ সম্প্রদায়ই শুধু টার্গেট? আসলে বিজেপি সরকার এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চাইছে। একটা হচ্ছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এই মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তিকে আশ্বস্ত করা এবং এর মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সংখ্যাগুরু ভোটের পালে হাওয়া তুলে ২০২৬-এর নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়া। এটা সর্বজনবিদিত যে গত ৫০ বছর ধরে আসামের রাজ্য রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে তথাকথিত এই বাংলাদেশি ইস্যুতে। কংগ্রেস ৪০ বছর এই ইস্যুকে জিইয়ে রেখেছে। এখন বিজেপি ঘরে ফসল তুলছে। বিজেপি দেখাতে চাইছে, কংগ্রেস ৪০ বছরে যা করেনি, এই তথাকথিত 'বাংলাদেশি মিঞা'দের কোমর ভেঙে দিয়ে তারা নাকি ভূমিপুত্রদের ভূমির অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করছে!

অন্য দিকে, উচ্ছেদ করার পর এই হাজার হাজার বিঘা জমি রামদেব, আম্বানি, আদানিকে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিজেপি সরকার আদানি গোষ্ঠীর সাথে কয়েকটা চুক্তিও করে রেখেছে। কোকরাঝাড়ের পর্বতঝোরায় প্রায় ৩ হাজার বিঘা ভূমিতে আদানি বিদ্যুৎ প্রকল্প করবে। ইতিমধ্যে রামদেব এবং বেদান্ত গোষ্ঠীকে কয়েক হাজার বিঘা জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার ভূমিহীন গরিব মানুষকে মাথা গোঁজার জন্য এক টুকরো ভূমি দিতে পারে না, অথচ মানুষকে মেরেধরে উচ্ছেদ করে জমি উদ্ধার করে সেই জমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। একমাত্র জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলনই পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের এই অন্যায়কে রুখে দিতে পারে।

সমর্থক খুঁজে পেলেন না 'বিশ্বগুরু'

তিনের পাতার পর

কখনও নয়। এই নিরিখেই বিষয়টি দেখা দরকার।

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের কথা বলা হলেও এবং সে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তেল ও অস্ত্র আমদানি করলেও, কিংবা যে ফ্রান্সের থেকে অত্যন্ত চড়া দামে কেনা রাফাল বিমানই ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করেছে সেই ফ্রান্স— কেউই পহেলগাম হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করতে রাজি হয়নি।

ভারত প্রথম থেকেই প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার পক্ষে থেকেছে। অথচ বিজেপি সরকার হঠাৎই প্যালেস্টাইনের থেকে সেই সমর্থন তুলে নিয়ে দেশের একচেটিয়া পুঁজির ব্যবসায়িক স্বার্থে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে শুরু করেছে। গাজায় তীব্র মানবিক সঙ্কট তৈরি হলেও রাষ্ট্রপুঞ্জে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ থামাতে ইজরায়েল-বিরোধী প্রস্তাবকে সমর্থন করেনি। যা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে ভারত বিরোধী মনোভাবকেই বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

ভারত ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরোধিতা না করে রাশিয়া থেকে সস্তা তেল সহ অন্যান্য সুবিধা নিয়েছে। আর মুখে বলেছে, এখন যুদ্ধের সময় নয়, বা যুদ্ধ কোনও সমাধান নয়। আলাপ-আলোচনা এবং কূটনীতিই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল-আমেরিকার হামলার বিরোধিতা না করে ভারত কূটনীতি এবং আলাপ-আলোচনার কিছু শুকনো কথা শুনিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে। সেই ভারতই পাকিস্তানের প্রশ্নে কূটনীতির রাস্তায় না গিয়ে, সন্ত্রাসবাদে মদতের বিষয়টি বিশ্বের সামনে তুলে ধরে তাকে একঘরে করার সময়সাপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজটি এড়িয়ে গিয়ে সামরিক হামলা চালাল। অর্থাৎ প্রতিবেশী হোক বা অন্য কোনও রাষ্ট্র, কোথাওই বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা কোনও নির্দিষ্ট নীতিতে স্থির থাকতে পারেননি। বাস্তবে দেশের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ দেখতে গিয়ে তাঁরা নীতির সাথে আপস করেছেন। বাস্তবিক বিশ্বজুড়ে আজ সংকীর্ণ স্বার্থই রাষ্ট্রগুলির প্রধান পরিচালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করছে। তাই তারা বাস্তবে যেমন কেউ কারও বন্ধু নয়, তেমনই কোনও দেশের উপর ঘটে যাওয়া অন্যায়কে অন্যায় বলতেও তাদের এই সংকীর্ণ স্বার্থই পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এই অবস্থায় বিশেষ কোনও সংকটে পাশে দাঁড়ানোর মতো বন্ধু খুঁজে পাওয়া মুশকিল হচ্ছে। সব মিলিয়ে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারত আজ নিজেই একঘরে হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো ব্রিকস বা কোয়াড সম্মেলনে পহেলগাম সন্ত্রাসের নিন্দাকেই বিরাট সাফল্য হিসাবে তুলে ধরতে হচ্ছে সরকারকে।

পিএমপিএআই-এর আলোচনা সভা

পিএমপিএআই, নদিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে চাপড়া ব্লকে বন্ধন লজে ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সাংগঠনিক আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মানস কর, জেলা ইনচার্জ লক্ষণ শর্মা, রাজ্য কাউন্সিল সদস্য সুশান্ত বিশ্বাস।

ব্লকের ৭০ জন গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশাসনিক বিভিন্ন অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়। সভা থেকে ২০ জনের চাপড়া ব্লক প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 48 Bengali Weekly July 11, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

জয়নগরে যুব শিক্ষাশিবির

বিপ্লবী যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও ৬০তম বর্ষে পা রাখল ২৬ জুন। যুব আন্দোলনের এই দীর্ঘ সংগ্রামী অধ্যায় উদযাপন উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর শহরে ২৮-২৯ জুন অনুষ্ঠিত হল দু'দিনের রাজ্য যুব শিক্ষাশিবির। শিবিরের প্রথম তিনটি অধিবেশনে আলোচনা করেন এসইউসিআই(সি) পলিটবুরো সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি সহজ ভাষায় সমাজ পরিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদিকা শক্তি, বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের উপর যে বল্গাহীন আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

শেষ অধিবেশনে এসইউসিআই(সি)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ যুবকদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, সাহস ও তেজ বাড়িয়ে যুব আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। শিবিরে প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি অংশ নেন।

মৈপীঠে কমরেড সুধাংশু জানা শহিদদিবস পালন

দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, মৈপীঠের বিশিষ্ট জননেতা কমরেড সুধাংশু জানা ২০২০ সালের ৪ জুলাই তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হন। এ বছর ৪ জুলাই এসইউসিআই(সি) মৈপীঠ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর পঞ্চম শহিদ দিবস পালিত হয়। সকালে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। এ দিনের বিনামূল্যের স্বাস্থ্যশিবিরে প্রায় ২০০ জন চিকিৎসা করান।

বিকালে স্মরণসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী, কমরেড সুধাংশু জানার বন্ধু রঞ্জিত নাইয়া। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন দলের বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড লাল্টু সরদার। ছিলেন এই জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং কমরেড সুধাংশু জানার স্ত্রী কমরেড গীতা জানা।

রাজ্য জুড়ে শহিদ বরুণ বিশ্বাস স্মরণ

৫ জুলাই ছিল অত্যাচারী শাসকের দুর্নীতি বন্ধের ও নারীর মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের অক্লান্ত যোদ্ধা শহিদ বরুণ বিশ্বাসের ১৩তম স্মরণ দিবস। এ দিন 'বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি'র উদ্যোগে ও আহ্বানে বিভিন্ন সংগঠন রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রায় ৫০০টি স্থানে তাঁর ছবিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান ও শপথ বাক্য পাঠ করে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাস্তার মোড় এবং অনেকে নিজের বাড়িতেও এ দিন এই সংগ্রামী শহিদকে স্মরণ করেন।

এ দিনের মূল কর্মসূচি পালিত হয় তাঁর কর্মক্ষেত্র কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন) স্কুলে। সকালে মঞ্চে রাখা ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কমিটির সহ সভাপতি তপন সামন্ত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সায়ন্তন দাস, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী সহ অসংখ্য মানুষ। এ ছাড়াও ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিভিন্ন গণ সংগঠনের প্রতিনিধিরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। দুপুরে স্কুল প্রাঙ্গণে কমিটি পরিচালিত সেল্ফ ডিফেন্স কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা ক্যারাটে প্রদর্শন করে।

এরপর স্কুলেরই বরুণ বিশ্বাস স্মৃতি হলে একটি কনভেনশন হয়। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মীরাতুন নাহার। বক্তব্য রাখেন এই স্কুলের প্রাক্তনী ও শিল্পী কল্যাণ সেন বরাট, চলচ্চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, অভয়া আন্দোলনের নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, শিক্ষাবিদ তপন সামন্ত, প্রাবন্ধিক সৌরভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

তেলেঙ্গানায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত কারখানা পরিদর্শন করলেন এস ইউ সি আই (সি) প্রতিনিধিদল

তেলেঙ্গানার সিগাচি রাসায়নিক কারখানার একটি চুল্লিতে ৩০ জুন সকালে বিস্ফোরণ ঘটে। সরকারি মতে এই বিস্ফোরণে মারা গেছেন ৪০ জন শ্রমিক, আহত ৩০ জন, যার মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার পর দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সিএইচ মুরাহরি, কমরেড পি তেজা, কমরেড সেখ জানিবাশা এবং কমরেড নাগরাজকে নিয়ে গঠিত দলের একটি প্রতিনিধিদল কারখানাটি পরিদর্শন করেন। শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে কারখানা-কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলার বিষয়টি তাঁদের চোখে ধরা পড়ে। এ বিষয়ে সরকারের শ্রম-দফতরের নজরদারির অভাবেরও তাঁরা নিন্দা করেন।

তাঁরা জানান, ওই কারখানায় বহু ঠিকা-শ্রমিক কাজ করেন। অথচ তাঁরা কী ভাবে দিন যাপন করেন, কর্তৃপক্ষ তার খোঁজটুকুও রাখে না। পরে প্রতিনিধিদল হাসপাতালে ভর্তি আহত শ্রমিকদের দেখতে যান (ছবি)।

ডায়মন্ডহারবারে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ২ জুলাই ১১ দফা দাবিতে ডায়মন্ডহারবার এসডিও দফতরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্ররা। এসডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড সপ্তর্ষি রায় চৌধুরী, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অরবিন্দ প্রামাণিক, ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার কনভেনর কমরেড বিপ্লব হালদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

নদিয়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সার্কুলারে সম্প্রতি বলা হয়েছে, স্কুলসংলগ্ন পথকুকুরদের পরিচর্যা, খাওয়ানো, টিকাকরণ ও নির্বীজকরণ প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব মিড ডে মিল কর্মীদের মধ্যে একজনকে নিতে হবে। এই দুর্মূল্যের বাজারে মাসে মাত্র দু'হাজার টাকার বিনিময়ে প্রতিদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় মিড ডে মিল কর্মীদের। এর উপর এমন একটি কাজের দায়িত্ব নেওয়া বাস্তবিকই তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। এর সাথে যুক্ত রয়েছে কুকুরের কামড়ের আশঙ্কাও। এর প্রতিবাদে ওই সার্কুলার অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ৩ জুলাই নদিয়া জেলার কল্যাণীতে এসডিও দফতরে বিক্ষোভ দেখান মিড ডে মিল কর্মীরা (ছবি)। পরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এরপর কর্মীরা এসডিও অফিসের সামনের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি অবরোধ করেন।

হাওড়া ঃ আমতা ১-এর এসডিও দফতরে ওইদিন একই দাবিতে বিক্ষোভ দেখান ও দাবিপত্র জমা দেন মিড ডে মিল কর্মীরা। এর আগে আমতা স্টেশনের কাছে জমায়েত হয়ে ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে একটি মিছিল হয়।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com